ড. হিশাম আল-আওয়াদি

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

অনুবাদঃ মাসুদ শরীফ

লেখক সম্পর্কে

ড. হিশাম আল-আওয়াদির জন্ম কুয়েতে। পড়াশোনা করেছেন ইতিহাস, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিষয়ে। অধ্যয়নের সময়টা কাটিয়েছেন ক্যামব্রিজ, এক্সেটারসহ আরো কয়েকটি ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটিতে।

পিএইচডি ডিগ্রিধারী এই গবেষক একসময় অধ্যাপনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আর যুক্তরাজ্যের এক্সেটার ইউনিভার্সিটিতে।

ড. হিশামের আগ্রহের বিষয় মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, উদ্দীপ্ত করা। নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো।

বর্তমানে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ কুয়েতে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। শিক্ষকতা পেশায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তার ঝুলিতে আছে 'ইনোভেটিভ লেকচারার অ্যাওয়ার্ড (২০১৩)' এবং 'ফ্যাকাল্টি মেনটরশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০১২)'।

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি

অনুবাদক : মাসুদ শরীফ

সম্পাদনা :

আবু সাঈদ আল-আযহারি	স্নাতক, ইসলামি শারি'আহ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়।
নাজিম মাহমুদ	মোহাদ্দিস, জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল ইসলামিয়া, আশুলিয়া মডেল টাউন সাভার, ঢাকা।

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি

অনুবাদক : মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (২য় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

পরিবেশক

৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর, ২০১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
তৃতীয় সংস্করণ : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

শব্দ বিন্যাস : মো: জহিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর
মুদ্রণ : মো: আমিনুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০

ISBN-978-984-92959-5-2

Be Smart With Muhammad (SW) by Dr. Hisham Al Awadi.
Published by Guardian Publications, Price Tk. 250 Only.

প্রকাশকের কথা

বাবা হারানো শিশুদের সামনে কখনো চার বছরের পিতৃহারা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে দাঁড় করিয়েছেন? বাবা-মা হারানো এতিম শিশুর সাথে কখনো কি পাঁচ বছরের এতিম মুহাম্মাদ ﷺ-এর বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পেরেছেন? আমাদের টিনএজ প্রজন্ম একুশ শতকের আজকের দিনে এসে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিশোর মুহাম্মাদ সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জ সামলিয়েছিলেন দারুণভাবে। তিনি তারুণ্যের সংকট মোকাবেলা করেছেন, তারুণ্যের রক্ত ও শক্তি পরিশীলিত সমাজ গঠনে কাজে লাগিয়েছেন। আজকের তরুণরা সেদিনের যুবক মুহাম্মাদকে পড়ে ইমপ্রেস না-হয়ে পারবেই না! নবুওয়াতের আগেই একজন ক্রিয়াশীল ইফেক্টিভ মানুষ হিসেবে সমাজে জায়গা করে নেয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ত্রিশের কোঠার টগবগে মানুষগুলোর রোল মডেল না-হয়ে কি পারে? নবুয়্যতের পরের নবিজি ﷺ-এর যাপিত জীবন, কর্মপদ্ধতি আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তো অতুলনীয়, অসাধারণ!

রাসূল ﷺ-এর জীবনকে নানাভাবে লিখা হয়েছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কুয়েতের প্রফেসর ড. হিশাম আল আওয়াদি তাঁর 'Muhammad: How He Can Make You Extra-Ordinary' বইয়ের মাধ্যমে এক নতুন ধারায় রাসূল ﷺ-কে উপস্থাপন করেছেন। বইটির মাধ্যমে শৈশবের নবিজিকে দেখিয়ে শিশুদের করণীয় খুঁজে দিতে পারবেন, বাবা-মা তার সন্তানকে প্রতিপালনের ধারণা নিতে পারবেন, তরুণরা তাদের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপাত্ত খুঁজে পাবেন। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্টাইল যে কেউ নিজের জীবনে প্রয়োগ করার পথরেখা পাবেন। রাসূল ﷺ-এর মতো নিখুঁত ও স্মার্ট হওয়া হয়তো অনেক কঠিন; এই বই আপনাকে অন্তত তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অসাধারণ এই বই 'বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ' নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ সত্যিই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। স্যোশাল মিডিয়াতে এই বই নিয়ে কয়েকজন সম্মানিত আলেম সমালোচনা করেছেন, প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি গঠনমূলক সমালোচনাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান আলেমের সাথে আলোচনা করে ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। যারা ভুলগুলো আন্তরিকতার সাথে ধরিয়ে দিয়েছেন, তাদেরকে হৃদয়ের গহীন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাব্বুল আলামিন এই প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমরা সচেতনভাবে কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে চাইনি, চাই না। এরপরেও কেউ কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর করলে, আমরা সংশোধন করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে *'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন'* অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি দ্বিনের মানদণ্ডে আপনার স্মার্টনেস বাড়াতে সামান্যতম সহায়ক হলেও আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

অনুবাদকের কথা

নিখাদ আত্মোন্নয়নমূলক বই। পশ্চিমে এ ধরনের বই প্রচুর। ওখানে এসব বইয়ের কাটতিও থাকে অনেক। বাংলায় সে তুলনায় এই ধরনের বই আঙুলের কড়িতে গোনা যাবে। পশ্চিমা সমাজের বাইরের মেকআপটা নিলেও, ভেতরের সৌন্দর্যটা নিতে বড় অনীহা আমাদের।

এধরনের বইগুলো শতভাগ প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত। কীভাবে কী করবেন, কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করবেন তা-ই হাতে-কলমে বলা।

পশ্চিমা বইগুলোতে এসব বলা থাকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণা এবং তাদের নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে। কিন্তু এই বইয়ে পশ্চিমা গবেষণার সাথে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের। আমার জানামতে এরকম বই এটাই প্রথম।

নবিজি ﷺ নবুওয়াত পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু নবি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল উনার প্রস্তুতিকাল। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আল্লাহ নিজের হাতে গড়েছেন তাকে। আমি অনেককে দেখেছি, দীর্ঘকাল ইসলাম চর্চা করার পরও নবিজির আদলে নিজেকে পুরোপুরি সাজাতে পারছেন না। খাবারে লবণ কম হলে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ। কাজের লোকের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার। বসের সামনে ব্যক্তিত্বহীন হুজুর হুজুর। অধীনস্থের উপর জোর গলা। খাবারদাবারে নিয়ন্ত্রণ নেই। আচার-ব্যবহারে চলনে-বলনে মাধুর্য নেই। আমরা জানি নবিজি ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন পরাকাষ্ঠা। কিন্তু কোথাও বলা হয় না কীভাবে তিনি তা হলেন? দেখানো হয় না আমাদের সময়ে কীভাবে আমরা উনার পথরেখা অনুসরণ করে স্মার্ট হব।

নবিজি ﷺ কী ছিলেন, তা সবাই কমবেশি জানি। কীভাবে সেই 'কী' হলেন তা জানতে এবং হতে- এই বই হবে আপনার প্রথম ধাপ।

মাত্র ৩ মাসের ব্যবধানে বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। সম্পূর্ণ নন-ফিকশন ধাঁচের হওয়ার পরও বইটি যে পাঠকমহলে এভাবে সাড়া ফেলেছে, সেটা বেশ অনুপ্রেরণার। আমার লেখক জীবন শুরুর অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল দ্বিন সম্পর্কে যারা অতটা সচেতন নন, তাদের মাঝে দ্বিনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালাকে অনেক ধন্যবাদ যে এ বইটির ব্যাপারে অনেক নন-প্র্যাকটিসিং ভাই-বোন আগ্রহ দেখিয়েছেন। দ্বিনের প্রতি তারা হয়তো ততটা সচেতন নন। হয়তো এই বই পড়ে তারা নবিজির জীবনকে জানতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হবেন। ইসলামকে গৎবাঁধা ধর্মের বাইরে একটা সম্পূর্ণ জীবনবিধি হিসেবে নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। এক কথায় বইটার সাফল্য এখানেই।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com

লেখকের কথা

জীবনে যারা বিশেষ কিছু হতে চান, এই বইটি তাদের জন্য। বইটির পরতে পরতে রাসূল ﷺ-এর জীবনের এমন সব ঘটনা থাকবে, যেগুলো মানুষকে অনুপ্রেরণা দিবে দারুণভাবে। অবলীলায় তারা তাঁকে গ্রহণ করবেন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে।

বইটিতে তাঁর নবি হওয়ার আগের জীবন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমরা দেখব শিশুকাল থেকে কীভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। টিনএজ বয়সের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবেলা করেছেন। তরুণ বয়সেই কীভাবে সমাজে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

সাধারণত জীবনীগ্রন্থগুলোতে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, এখানে ইচ্ছে করেই সেগুলো সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই বইয়ে আমাদের ভাষা অনেকটা ঘরোয়া। অনেকটা সাদাসিধে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে যেসব জীবনী লেখা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগে দুটো জিনিস হামেশা পাওয়া যায়; রাসূল ﷺ-এর ৪০ বছরের পরের জীবন আর পাঠকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সম্ভ্রম জাগানো।

কিন্তু এ ধরনের লেখনীতে তরুণ পাঠকেরা নিজেদের কমই খুঁজে পায়। বইগুলোতে তাঁকে এতটাই নিখুঁত পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়। তরুণরা অনেক সময়ই তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সংকটের সাথে রাসূল ﷺ-এর জীবনী মিলিয়ে নিতে পারে না।

অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব স্পষ্ট করে বলেন,

> 'আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য আছে ভালো ভালো উদাহরণ'। সূরা আহযাব : ২

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক যতটা কাছের হওয়া উচিত, ততটা হয় না।

শিশুরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ একসময় তাদের মতোই শিশু ছিলেন। তিনি খেলেছেন, দৌড়াদৌড়ি করেছেন। টিনএজাররা কখনো ভাবেই না যে, তারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে দিন পার করছে, রাসূল ﷺ-কে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমাদের তরুণরা জানে না কীভাবে তিনি পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছেন, কীভাবে তিনি অচলাবস্থার নিরসন করেছেন।

এই বইয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ, কৈশোরের মুহাম্মাদ ﷺ এবং নবুয়তের আগের যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা প্রিয় নেতাকে জীবনের চেয়েও ভালোবাসি। কিন্তু আমরা তাঁকে এমন সম্ভ্রম জাগানিয়া নিখুঁত মানুষ হিসেবে তুলে ধরি যে, আমাদের সময়ে তাঁকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা কেন যেন রাসূল ﷺ-কে কঠিন করে উপস্থাপন করতে চাই।

এই বইতে পাঠক তাঁর সম্পর্কে এক নতুন চিত্র পাবেন। তারা দেখবেন কীভাবে তিনি আমাদের মতোই, আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলোর মোকাবেলা করেছেন। সেগুলোর মোকাবেলায় তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

পাঠক আরও খেয়াল করবেন যে, এখানে নিজের জীবন উন্নয়নের ধাপগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিরাচরিত বইগুলোর বর্ণনা ভঙ্গিতে অনেক সময় মনে হয়, আমরা কী আর তাঁর মতো হতে পারব? এ ধরনের হীনমন্যতা দূর করে বাস্তব পদক্ষেপ দেখিয়ে দেয়াই মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে মানুষ যতটা নিখুঁত হতে পারে নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ তা-ই ছিলেন। কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি ছিলেন মানুষ। মানুষ হিসেবে অনেক সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ইস্যুতে প্রিয় নবিজি আর আমাদের মাঝে দারুণ কিছু মিল আছে। আমরা সহজাত উপায়েই নবিজিকে অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর ব্যাপারে আমি যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছি, সেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণিত দলিল থেকে নিয়েছি। অন্যান্য কিছু বইয়েরও সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- আকরাম উমারি। আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়াহ আস-সাহীহাহ (নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী)।
- মাহদি রিযকুল্লাহ আহমাদ, আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়া ফি দাওউল-মাসাদির আল-আসলিয়াহ (আদি উৎসের আলোকে ইসলামের নবির জীবনী)।

আত্মোন্নয়নমূলক বিভিন্ন বইয়ের অনেক বিষয় আমি এখানে নিয়ে এসেছি। বিশেষ করে যেগুলো ইসলামের সাথে খাপ খায়, যেগুলো রাসূল ﷺ-এর জীবনে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে সামাজিক বিচারবুদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া, নেতৃত্ব বিকাশের মতো বিষয়গুলো।

চিরাচরিত জীবনীগ্রন্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইকে দেখাটা ঠিক হবে না। সত্যিকারার্থে এটা ঐ শ্রেণিতে পড়ে না। আবার ঠিক আত্মোন্নয়নমূলক বইও না। আমি এই দুই ধরন মিলিয়ে এক অনন্য মিশেল তৈরি করতে চেষ্টা করেছি।

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল

সাধারণত বাচ্চাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রথম ছয় বছরে। এ সময়টাতে তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা আর মনোযোগ প্রয়োজন। 'কোয়ালিটি টাইম' বা মানসম্পন্ন সময় বলে আমরা একটা বিষয় জানি। আমাদের ব্যস্ত জীবন আর ক্রমাগত সব মনোযোগ বিঘ্ন করা বিষয়ের মাঝে শিশুদেরকে আরও বেশি সময় দিতে হবে। যত্ন নিতে হবে। বিধবা মা আমিনার আলিঙ্গন, চুমু আর মায়াভরা হাসির মধ্য দিয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবেগী প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়েছে। শিশুদের জন্য এমন আনন্দ-উত্তেজনাময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা জীবনের জরুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে সেটা ছিল মরুপ্রান্তর। আমাদের জন্য তা হতে পারে স্কুল, দিবা সেবাকেন্দ্র, রিডিং ক্লাব, আত্মীয়স্বজনের বাসা বা শিশুকেন্দ্রিক ফিটনেস সেন্টার।

মানসিক বিকাশ

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবু তালিবের সাথে থাকেন। একটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য যে ধরনের আদর, ভালোবাসা ও যত্ন দরকার ছিল, তার সবই তিনি তাঁদের কাছে পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, মরুভূমির কঠিন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছে জীবনমুখী নানা দক্ষতা অর্জনের উৎসাহ।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রথম ছয় বছরে। প্রথম বছরে শিশুর মধ্যে অনুভূতি জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় বছর থেকে তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। তৃতীয় বছরে বাচ্চারা অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে। চতুর্থ বছর থেকে ধীরে ধীরে তারা হয়ে ওঠে আত্ম-নির্ভরশীল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ বছরে তারা নিজেদের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরতে শেখে। এ সময় নিজেদের আবেগ-অনুভূতিগুলো আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে শেখে। শিশুদের এই ছয় বছরের ব্যাপারগুলো একটি চার্টে আমরা দেখব।

প্রথম বছর	অনুভূতি জন্মলাভ করে।
দ্বিতীয় বছর	শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে।
তৃতীয় বছর	অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে।
চতুর্থ বছর	আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে।
পঞ্চম বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।
ষষ্ঠ বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।

এই অধ্যায়ে আমরা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাল্যকালকে দেখব। তাঁকে বড় করতে যেয়ে তাঁর মা ও দুধ-মা কী বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন, তা দেখব। এরপর দেখব, তাঁর শিশুকালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কীভাবে শিশুদের বড় করতে পারি।

ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা

পরিবেশ আর ব্যক্তিত্ব ভেদে শিশুদের বেড়ে ওঠার গতি কমবেশি হয়ে থাকে। সে হিসেবে বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বড় ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দুবছরের নিচে, তখন তাঁর এনার্জি দেখে অনেকেই অবাক হতেন। তারপরও শিশুদের মাঝে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যা মোটামুটি সবার জন্য এক। ছয় বছর পর্যন্ত একজন শিশুর বেড়ে ওঠার ব্যাপারগুলো আমরা আরেকটি চার্টে দেখব।

ছয় মাস	শিশু তার মায়ের কণ্ঠ চিনতে পারে। পরিচিত চেহারা দেখে হেসে ওঠে।
নয় মাস	তাদের মধ্যে প্রথম কৌতূহলের ছাপ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে উদ্বেগও দেখা যায়।
এক বছর	চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগে। সাধারণ নির্দেশনাগুলো বুঝতে শেখে।
দুই বছর	প্রায় দু'শ শব্দের মতো শব্দভাণ্ডার জমা হয়।
তিন বছর	এটা কেন, ওটা কেন- এমন প্রশ্ন করতেই থাকে। অন্যদের সাথে খেলাধুলা ও সাহায্যের মনোভাব গড়ে ওঠে। অন্যকে খুশি করতে চায়।
চার বছর	কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মজা করে। এক থেকে বিশ গুনতে শেখে।
পাঁচ বছর	শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। সময়ের ব্যাপারে সজাগ হয়।
ষষ্ঠ বছর	কথাবার্তা বলায় আস্থাশীল হয় এবং কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়।

শিশুরা সাধারণত প্রথম পর্যায়গুলো মায়ের সাথে বেশি কাটায়। অনুভূতি সংক্রান্ত চাহিদাগুলো তিনিই পূরণ করেন। আর পরবর্তী পর্যায়গুলো সামাজিক আর ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে কেটে যায়। আমরা দেখি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনেও এমনটা হয়েছে। অন্য আর দশটা শিশুর মতো তাঁর ঐ সময়টাও কেটেছে একান্তে মায়ের সাথে।

ভালোবাসার চাহিদা পূরণ

বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের আর্থিক দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। সংসার খরচের চিন্তা না-থাকায় মা আমিনা তার পুরো সময়টা ছেলের পেছনে দিতে পেরেছিলেন। মা হিসেবে বাবা না থাকার কষ্ট কিছুটা হলেও পুষিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কখনো আদরঘন আলিঙ্গন, কখনো মমতামাখা চুমু, কখনো-বা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার হাসি, এভাবেই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন মা আমিনা। শিশুকালে রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে খুব বেশি একটা সময় কাটাতে পারেননি। অনেক শিশুরা এ বয়সে মায়ের সাথে অনেক সময় কাটায়।

কিন্তু তারপরও শিশু মুহাম্মাদ ﷺ যে ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন, সেটা আজকাল অনেক শিশুর ভাগ্যেই জোটে না।

আজকালকার মায়েরা অনেক বেশি ব্যস্ত। অনেক দায়িত্ব; ঘর সামলানো, চাকরি, স্বামীসেবা, অন্যান্য বাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি। মা আমিনার কাঁধে এত বোঝা ছিল না। সংসার খরচের দায়ভার নিয়েছিলেন দাদা। কুঁড়ি বছর বয়সেই বিধবা আমিনাকে এসব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। আমিনার সব ব্যস্ততা ছিল একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদকে ঘিরে।

তখনকার সমাজে সন্তানের বেড়ে ওঠায় বাবারাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি মেনে মা আমিনা তাঁর মাতৃসুলভ ভালোবাসা আর আদরের পুরোটাই একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব

শিশুর মানসিক বিকাশে ভালোবাসা আর আদরের প্রভাব অনেক। এতে তার নিজের ব্যাপারে আস্থা জাগে, আত্মবিশ্বাস জন্মে। আবেগ-অনুভূতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, এতে করে শিশুরা নিজেদের নিরাপদ মনে করে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা বাড়ে। আপনিও আপনার বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরুন। ঘুম থেকে ওঠার পর কিংবা বাইরে থেকে বাসায় এসে তাকে সালাম দিন। চুমু দিন। তার সাথে খেলুন। এগুলো ওর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখবে। আত্মমর্যাদা বাড়াবে।

আপনার অবস্থা হয়তো এমন না যে, আপনি পারফেক্ট বাবা-মা হবেন। কিন্তু যতটুকু পারুন ওকে সময় দিন, আদর করুন। মনোযোগ দিন। মাঝেমধ্যে বা কেবল বিশেষ কোনো ঘটনায় ওর প্রতি আদর না-দেখিয়ে নিয়মিত দেখান।

কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন

- প্রতিদিন চুমু দিন, জড়িয়ে ধরুন।
- ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। বাধা দেবেন না।
- বাসার বাইরে থাকলে ফোন দিয়ে কথা বলুন।
- ওর সাথে খেলুন। নিজের পোশাক ময়লা হওয়া নিয়ে চিন্তার দরকার নেই।
- ভালোবাসা দিয়ে দিন শুরু করুন। আর অখুশি হয়ে কখনো দিন শেষ করবেন না।[১]

সন্তানের জন্য বাঁচা

মা আমিনার স্বামী মারা যান ৫৭১ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ। তারপরও তিনি কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তখনকার সমাজ অবশ্য বিধবাদের খাটো চোখে দেখত না। যাদের বংশ ভালো ছিল, তাদেরকে উঁচু নজরে দেখত। আমিনার রূপ আর কবিতা আবৃত্তির গুণে চাইলেই তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সমাজ যে তাঁকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেনি, তা কী করে বলি? কিন্তু তিনি বিধবাই থেকে গেলেন। সেই সমাজে বড় পরিবারের আলাদা মর্যাদা ছিল। আমিনার মনেও হয়তো অমন বড় পরিবারের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিনি হয়তো তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের জন্য নিজেকে কোরবান করেছিলেন। শিশু মুহাম্মাদের জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে নিজের জীবনের সাথে আপোষ করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। ছিল প্রথাবিরোধী। বিশ বছর বয়সী এক বিধবা তরুণীর জন্য এই সিদ্ধান্ত যে অনেক কষ্টের ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন

শিক্ষাবিদরা শিশুদের জন্য আলাদা সময় রাখার গুরুত্বের কথা বলেন। যেন মনে হয়, শিশুদের সাথে সময় কাটানো একটা বোঝা। আনন্দের কিছু না। চাকরিজীবী মায়েরা তাদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এতে অনেক মা-ই মনে মনে এক ধরনের অপরাধবোধে ভোগেন। তাদের এই অপরাধবোধে প্রলেপ দেয়ার জন্য 'আলাদা সময়' ধারণার জন্ম হয়। অথচ আলাদা সময়ের বদলে আমাদের তো শিশুদের সাথে এমনিতেই সময় কাটানোর কথা। আর সেটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ঘড়ি ধরে কেন? কত সুন্দরভাবে সময় কাটাচ্ছি বিবেচনার সাথে সাথে কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছি, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ না। বাবা-মায়েরা সন্তানের সাথে যত বেশি সময় কাটাবে (এখানে 'বেশি' বলতে পরিমাণের কথা বলছি) তাদের সামাজিক, মানসিক ও একাডেমিক সমস্যা তত কম হবে। মাদকে জড়ানোর আশঙ্কা কমবে। বখাটেগিরি বা এ ধরনের কোনো অপরাধমূলক কাজ অথবা বিয়ের আগে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে হারাম সম্পর্কে জড়ানোর প্রবণতা কমবে। লরা রামিরেজের কথায় এমনটাই পাওয়া যায়-

'বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে যান। এটা ভালো। কিন্তু এটা কোনোভাবেই ভালো প্যারেন্টিং-এর বিকল্প নয়। বাবা-মা'কে তাদের বাচ্চার ছায়া হয়ে থাকতে হবে। এর মানে তাদের সাথে ভালো সময় কাটাতে হবে। ওদের সময়টা যখন ভালো যাবে না, তখন ওদের পাশে থাকতে হবে। ওদের প্রতিটা সমস্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।'[২]

বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী

- সময় কাটানো মানে এই না যে, সব সময় কিছু না কিছু করতেই হবে। ওদের সাথে থেকে ওরা কী করছে, না করছে তার ওপর নজর রাখাই যথেষ্ট।
- ওকে সময় দেয়া সংসারের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজের অংশ নয়। কাজেই ওকে এমনভাবে সময় দেবেন না, যাতে ওর মনে এই ধারণা উঁকি দেয়।
- যেকোনো সময় আপনার কাছে ঘেঁষতে ওর মনে যেন কোনো ধরনের সংকোচ কাজ না করে।

মরু শিক্ষা

রাসূল ﷺ ছোটবেলায় শুধু মায়ের কাছ থেকেই শেখেননি। তাঁর দুধ-মা হালিমা এবং তাঁর পরিবার থেকেও মানসিক বিকাশের শিক্ষা নিয়েছেন। হালিমার আরও তিন সন্তান ছিল- আবদুল্লাহ, আনিসা, শায়মা। সাথে ছিল তার স্বামী আল হারিস। মক্কা থেকে তাদের বাড়ির দূরত্ব ছিল ১৫০ কিলোমিটার। মাঝে মাঝেই এখান থেকে মক্কায় যাওয়া হতো তাঁর। প্রায় চার বছর তিনি এখানে কাটিয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছেন এখান থেকে।

সে সময়কার আরব উপদ্বীপের মরুভূমি অঞ্চল সম্পর্কে জানলে সহজে বুঝতে পারব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাল্যকালে মরুভূমির ভূমিকা কেমন ছিল। কী কী মূল্যবোধ তিনি এখান থেকে শিখেছেন।

তখন স্কুল-কলেজ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। মরুভূমির এক একটা পরিবারই ছিল এক ধরনের স্কুল। শহরের মা-বাবারা বাচ্চাদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই মরুর এসব পরিবারে পাঠাতেন।

মূলত, গ্রামাঞ্চল ও মরুভূমির চেয়ে শহর অঞ্চলে অসুখ-বিসুখের মাত্রা ছিল তুলনামূলক বেশি। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। ইসলামের বার্তা পুনরায় চালু হওয়ার আগে থেকেই সেখানে হজ্বের রীতি বহাল ছিল। হজ্বের সময়ে স্বাভাবিক কারণে লোকজনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত। যার কারণে নানা রকম রোগ বালাই এর আশঙ্কাও বৃদ্ধি পেত। এসব কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেসময় অধিকাংশ শহুরে পরিবারের বাচ্চাদের মরু অঞ্চলে পাঠানো হতো। তাছাড়াও মরু অঞ্চলের কথ্য আরবি যেকোনো ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। মরুভূমির বেশিরভাগ নারীই পেশা হিসেবে বা পারিবারিক বন্ধন গড়ার খাতিরে শহরের বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য নিয়ে যেতো। নতুন আর অজানাকে জানার, আবিষ্কারের পসরায় সজ্জিত ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত বালুচর। শহরের দালানঘরে সেই সুযোগ কোথায়?

মরুভূমিতে থেকে থেকে শিশু মুহাম্মাদের সামাজিক আর যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে। শারীরিক সামর্থ্য বেড়েছে। ভাষা শাণিত হয়েছে। সে সময়ের মরু-অঞ্চল, বাচ্চাদের এসব দিকগুলো বিকাশের জন্য দারুণ সহায়ক ছিল।

তবে আজকের জমানায় এসে আমি আপনার শিশুকে মরুভূমিতে পাঠাতে বলব না। কিন্তু যেসব পরিবেশ শিশুদেরকে উদ্দীপ্ত করবে, সেগুলোকে কখনোই উপেক্ষা করবেন না। এগুলো হতে পারে স্কুল, দিবাসেবা, আত্মীয়ের বাসা কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু। খেয়াল রাখতে হবে, এই জায়গাগুলো যেন নিরাপদ হয় এবং শিশুর প্রতিভা বিকাশ ও আবিষ্কারে সহায়ক হয়।

মরুজীবন

মরুজীবনের বাস্তবতা বুঝার দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা–

- মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে মরু জীবন কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল।
- তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখতে পারি।

মরুবাসীদের জীবন ছিল যেনতেন উপায়ে বেঁচে থাকা। টিকে থাকাটাই মূখ্য। বিলাসিতার কোনো জায়গা নেই সেখানে। শুষ্ক এই আবহাওয়ার তীব্র দাবদাহে সূর্যের নিচে ডিম ভাজি হয়ে যেত। পানি আর ছায়া দুটোরই অভাব ছিল।

আজকাল আমরা পিপাসা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ পানি খাই, তখন তারা এত খাওয়ার সুযোগ পেত না। সামান্য পানি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য শুধু গলা ভেজাতেন। যেহেতু পানি কম ছিল, খাবারের উৎসও কম ছিল। মরুদ্যান, কুয়ো বা ঝরনার আশপাশ ছাড়া ফসলের ক্ষেত খুব একটা হতো না।

খাওয়ার কষ্ট, পানির কষ্ট নিয়েই বেদুইনরা বাঁচতে শিখেছে। 'আরও খাবো, আরও খাবো'! এ রকমটা বলে অভিযোগ করতেন না। খাওয়া-দাওয়া বা ভোগ করা তখন আনন্দের জন্য ছিল না। ছিল টিকে থাকার জন্য। জীবনের এই কঠিনতা তাদেরকে জীবনের দুঃখকষ্টগুলোকে বিনা অভিযোগে বরণ করতে শিখিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ধরনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর ওপর এই পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তিনি কখনো পেট পুরে খাননি। ক্ষুধার যন্ত্রণা দমন করার জন্য পেটে চ্যাপ্টা পাথর বাঁধতেন। এমন কত দিন গেছে তাঁর ঘরে চুলো জ্বলেনি। খুব কম সময়েই তিনি মাংস খেয়েছেন; বরং বেশিরভাগ সময়েই খসখসে রুটি খেতে হয়েছে। খাবার না থাকলে সিয়াম পালন করতেন। তালগাছের পাতা দিয়ে বানানো মাদুরে ঘুমোতেন।

বর্তমান দুনিয়ার চোখে দেখলে তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তিনি বাচ্চা বয়সেই এমনটা শিখেছেন। সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে রেখেছেন। এমনকি মক্কায় আসার পরও। মরুভূমিতে তিনি যেসব দামি মূল্যবোধ অর্জন করেছিলেন, তাঁর নিজ পরিবেশ সেগুলোকে আরও জোরদার করেছে।

মরুভূমি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ

রাসূল ﷺ মরুজীবন থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর মা সেটার মূল্য বুঝেছিলেন। স্কুলে যদি ভালো কিছু শেখায়, তাহলে বাবা-মায়েদের বিরোধী কিছু শেখানো ঠিক হবে না। শিশুকে বরং এমন পরিবেশ দিতে হবে, যেটা তার স্কুলের শিক্ষাকে আরও পোক্ত করবে। মরুস্কুলে রাসূল ﷺ সহ্য করার ক্ষমতা আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে শিক্ষা নিয়েছিলেন, মা আমিনা তার ঘরে সেই একই শিক্ষা জারি রেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মরু শিক্ষার বাস্তবতা পরিবারে এসেও পেয়েছিলেন। পারিবারিকভাবেই তাঁর জীবন ছিল সাদাসিধা, অনাড়ম্বর। তাঁর মা শুকনো মাংস খেতেন। দাদা দানের টাকা জোগাড় করে হজ্ব পালনকারীদের পানির ব্যবস্থা করতেন। চাচা যৌথ পরিবারের খরচ জোগাতেন। ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ পরিবারেই পেয়েছিলেন।

বাচ্চাকাচ্চারা স্কুলে যা শেখে, ঘরে এবং সাধারণভাবে সমাজে যদি সেই একই শিক্ষা জোরদার করে, তাহলে বাচ্চারা নিজেদের নিরাপদভাবে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়।

আত্মশৃঙ্খলার মূল্য

শৃঙ্খলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তাদের আচার-আচরণ সন্তোষজনক হয়। ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। তবে এজন্য বাবা-মায়ের তরফ থেকে এনার্জি ও কমিটমেন্টের দরকার হয়। বাবা-মা কতটা শক্তি ঢালবেন আর কতটা লেগে থাকবে তা নির্ভর করে বাচ্চার ব্যক্তিত্ব এবং কী রকম পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে তার ওপর।

রাসূল ﷺ মরুভূমিতে শৃঙ্খলার পাঠ নিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে ঘুমোতে যেতে হয়েছে। উঠতে হয়েছে। বিভিন্ন কাজেকর্মে সহযোগিতা করতে হয়েছে। গবাদিপশুর দেখভাল করতে হয়েছে। একটু অন্যরকমভাবে মক্কায় নিজের বাড়িতে সেই একই শৃঙ্খলা জোরদার করা হয়েছে। বাচ্চার চারপাশ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় এমন শৃঙ্খলার মধ্যে বাচ্চাকে বেড়ে তোলা আজকের দিনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মন যা-ই চাক, বাচ্চাকে দায়িত্ববানের মতো কাজ করতে হবে এটাই শৃঙ্খলা। কচি বয়সেই এটা গড়ে তুলতে হবে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে বাচ্চাদের শৃঙ্খলা নিয়ে এক বিখ্যাত গবেষণা হয়। সেখান থেকে দেখা যায়, বাচ্চা বয়সে শেখা শৃঙ্খলা পরবর্তী বয়সে টেকসই হয়। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওয়াল্টার মিসচেল চার বছর বয়সী একদল বাচ্চাকে একটা করে মার্শম্যালো দেন। তাদেরকে দুটো অপশন দেন; 'হয় এখন খাও। নয় পরে খাও। তবে পরে খেলে আরেকটা মার্শম্যালো পাবে'। তো এই গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশুরা তাদের খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পেরেছিল, পরিণত বয়সে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার ছাপ বেশি পাওয়া গিয়েছিল। জীবনে তাদের অর্জনও বেশি।

বাচ্চাকাচ্চাদের শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে

মারধর, গালি-বকা দিয়ে শৃঙ্খলা শেখানো যায় না। সদয় আচরণ আর সুন্দর লালন-পালনের মাধ্যমে এটা সম্ভব। নিচে আমরা কিছু উপায় দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখুন–

- ভালো কাজের প্রশংসা করুন। এটা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। আর আপনাকে খুশি করার জন্য এমন কাজ বার বার করতে চাইবে।
- এমনভাবে বলুন যেন সে বুঝে।
- 'করো না' কথাটা অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না। 'গলার আওয়াজ উঁচু করো না'। এমনটা না বলে বলুন, 'একটু আস্তে কথা বলো'।
- বকাঝকার মধ্যে না রেখে মজাদার বিকল্পের ব্যবস্থা করুন।
- ওদের সাথে কোনো কিছু নিয়ে আলাপ করতে গেলে এমন সময় করবেন না, যখন আপনি রেগে আছেন। ওর মন খারাপের সময়ও আলাপ করবেন না।

সামাজিক দক্ষতা শেখা

মরুভূমিতে থাকা অবস্থায় শিশু মুহাম্মাদ ﷺ বেশকিছু কাজ করতেন বলে ধারণা করতে পারি। এই যেমন- পানি আনা-নেয়া, গবাদিপশুর দেখভাল, তাঁবু টাঙানো, খুলে ফেলা, বড়দের ও মেহমানদের সাহায্য করা। এগুলো তাঁর মধ্যে সহযোগিতা, ভাগাভাগি আর অন্যের দেখভালের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসগুলো গড়ে দিয়েছে।

শারীরিক সক্রিয়তার সাথে দক্ষ হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেসব শিশুরা শারীরিকভাবে বেশি সক্রিয়, তারা কম সক্রিয় শিশুদের তুলনায় সামাজিক দায়িত্ব ও নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালনে বেশি অগ্রণী হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে শিশুকে এজন্য যেন চাপাচাপি করা না-হয়। আর সক্রিয় হওয়ার জন্য ওর পরিবেশ নিরাপদ ও আরামদায়ক রাখতে হবে।

মরুভূমিতে দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা করার জন্য শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামনে ছিল প্রশস্ত মরুপ্রান্তর। শিশুসুলভ বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তিনি একে অন্যকে সহযোগিতা করতে শিখেছেন। অন্যের সাথে ভাগাভাগি ও দেখভাল করতে শিখেছেন।

শিশুরা যখন খুশিতে থাকে, আনন্দে থাকে, তখন তারা ভালো শেখে। মজাদার সময়গুলো শিশুদের বেড়ে ওঠার সেরা সময়। কারণ, তারা খেলতে পছন্দ করে। চমক পছন্দ করে। কোনো কোনো বাবা-মা মনে করেন শিশুদের খেলাধুলা মানে সময় নষ্ট। এমন ধারণা মোটেই ঠিক না।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ওরা যখন খেলার মধ্যে থাকে, তখনই ওরা সহজে শেখে। গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে।[৩]

গৎবাঁধা স্কুলগুলোতে কচি শিশুদের আদেশ-নিষেধের বেড়াজালে বন্দি করে ফেলা হয়। খালি পড়ো আর পড়ো। অন্যদিকে, উন্নতমানের স্কুলগুলোতে বিভিন্ন দক্ষতা আর আচরণ শেখানোর জন্য মজাদার কাজকারবার করা হয়।

খেলাধুলার গুরুত্ব

ছোট বয়সে তাদের খেলার সময়সীমা কেটে দিবেন না। এমন ভাবার দরকার নেই যে, তারা বড় হয়ে গেছে, এখন আর বেশি খেলার দরকার নাই। আবার সে কোন ধরনের খেলা খেলবে, সেটাও চাপিয়ে দিতে যাবেন না। শরীয়াহ সমর্থিত যেকোনো খেলা ওকে খেলতে দিতে পারেন।

শিশু মুহাম্মাদ ﷺ যখন অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, তখন বক্ষবিদারণের সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাজেই খেলাধুলার সময়কে অবমূল্যায়ন করবেন না। শিশুদের বেড়ে ওঠা ও শেখার জন্য এটা পার্ফেক্ট অপরচুনিটি।

মরুভূমিতে থাকার সময়ে তিনি দায়িত্ব ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারগুলো শিখেছেন। ওখানকার আবহাওয়া অনেক গরম। জীবন ধারণও কঠিন। কিন্তু মক্কার ব্যস্ত গলির চেয়ে মরুরাস্তায় তিনি ছুটে বেড়াতে পেরেছেন। যাযাবরদের জীবন মানে প্রতিদিন নতুন গন্তব্য। তাঁবু গাড়া, গবাদিপশু দেখা, আশপাশ দিয়ে যাওয়া কাফেলাগুলোকে সাময়িক আশ্রয় দেয়া আর নিরাপদ জায়গা খোঁজা।

নিঃসন্দেহে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ ধরনের পরিবেশ ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। উত্তেজনাময়। এটা তার চরিত্র বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। আমি আগেই বলেছি, আনন্দের মাঝে শিশুরা শেখে।

ভাষা দক্ষতা

মরুভূমির পরিবেশ তাঁর ভাষা দক্ষতা বাড়াতেও সাহায্য করেছে। স্কুলে ভর্তির আগের সময়টাতে শিশুদের মধ্যে এই দক্ষতা গড়ে ওঠে। মরুভূমির পরিবেশ বিজাতীয় সংস্কৃতি আর ভাষা বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। যে কারণে রাসূল ﷺ হয়ে উঠেছিলেন বিশুদ্ধভাষী। অনেক শব্দ শিখেছেন সেখানে।

মক্কায় তাঁর পরিবারের চেয়ে এখানে সদস্য সংখ্যা পাঁচজন বেশি ছিল। তাছাড়া ওখানে কেবল হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন আসত। এখানে প্রায়ই বিভিন্ন কাফেলা যেত। তাদের সংস্পর্শে তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক আরবির সান্নিধ্যে আসেন।

মক্কার লোকেরা তাদের শিশুদের যেসব কারণে মরুভূমিতে পাঠাত, তার মধ্যে একটি ছিল তাদের আরবির ভিত যাতে মজবুত হয়। কমবেশি চার বছর শিশু মুহাম্মাদ ﷺ সেখানে কাটিয়েছেন। আমাদের সময়ে হিসেব করলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে যে সময়টা বাচ্চাকাচ্চারা বাবা-মায়ের সাথে থেকে অনেক কিছু শেখার সাথে ভাষাটাও শেখে। তো ঐ বয়সে মরুভূমির অনুকূল পরিবেশ ভাষায় তাঁর শক্ত ভিত গড়ে দিয়েছিল।

অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার আগে বাচ্চাদের মধ্যে ভাষাপটুতা আগে তৈরি হয়। অনেক শিশু প্রথম বছরে বিভিন্ন শব্দ শেখে। দুই বছর থেকে চার বছরে শব্দভাণ্ডার সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে। চার বছরের মধ্যে গড়পড়তা একটি শিশু হাজার খানেক শব্দ শেখে। এসব শব্দ ব্যবহার করেই তারা তাদের চাহিদা তুলে ধরে। কথা বলে আত্মবিশ্বাস পায়।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, যেসব শিশুরা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। এতে করে তাদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু আচরণ চোখে পড়ে। যেমন : উগ্র মেজাজ, অযথা চিৎকার-চেঁচামেচি।

শিশুর ভাষাদক্ষতা কীভাবে বাড়াবেন

- পনের মিনিট করে ওকে গল্প পড়ে শোনান। বর্ণনামূলক গল্প শিশুর কল্পনাশক্তি ও শব্দভাণ্ডার বাড়ায়।
- ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। এতে করে ওর কথা বলার নৈপুণ্য বাড়বে।
- ওর মধ্যেও মন দিয়ে কথা শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ভাষাদক্ষতা বাড়ানোর জন্য অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বড়দের জন্যও এটা খুব কাজের।

মায়ের মৃত্যু

এ পর্বে আমরা কথা বলব রাসূল ﷺ এর মায়ের মৃত্যু নিয়ে। এরপর সেখান থেকে তাঁর দাদার বাড়িতে লালন-পালন। সেখানে কিন্তু তিনি চমৎকার আদরযত্নে লালিত-পালিত হয়েছেন। প্রতিটি শিশুর শৈশব এমনই হওয়া উচিত আসলে।

মক্কায় ফিরে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ দুবছর মায়ের সঙ্গে কাটান। মা আমিনা মারা যান ২৬ বছর বয়সে। তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স মাত্র ছয়। এত অল্প বয়সে যাদের মা মারা গেছেন, কেবল তারাই হয়তো তাঁর কষ্টটা বুঝতে পারবেন।

রোমান অর্থডক্স যাজক এবং ঔপন্যাসিক কন্সট্যান্টিন ঘিরঘিউ (Constantin Gheorghiu) তার বিখ্যাত 'লা ভিয়ে ডে মাহোমেত' (La Vie De Mahomet) বইতে সেই করুণ দৃশ্যের কল্পনা করেছেন এভাবে-

> 'শিশু তার মায়ের কবরের পাশে বসে আর্তনাদ করছে, 'মা, তুমি বাসায় আসো না কেন? এই জীবনে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে?'[৫]

এই বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য না। তবে এমন করুণ অবস্থার মুখোমুখি যারা হননি, তারা হয়তো এ থেকে তাঁর কষ্টের কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। বাবাকে তো তিনি কখনো দেখেনইনি। জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তিনি মায়ের খুব আপন ছিলেন। তার সাথে জড়িয়ে আছে কত না-ভোলা স্মৃতি।

বাস্তবে বলুন তো কে চায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে? কেউ না। তবে শিশুর কাছের কেউ, আপন কেউ যদি মারা যায়, বা তার সাথে বিচ্ছেদ হয়, সেক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় জানা জরুরি।

কীভাবে মোকাবেলা করবেন

- প্রথম দফাতেই তাকে মৃত্যুর খবরটা জানিয়ে দিন। কারণ, ঘরের পরিবেশ দেখে এমনিতেই সে বিষয়টা আঁচ করবে। আর তাছাড়া তার জানার অধিকার তো আছেই।
- বলার সময় বাচ্চার বয়সটাও মাথায় রাখবেন। ২ থেকে ৫ বছরের শিশুরা মৃত্যুকে ঘুমের মতো মনে করে। তারা মনে করে মৃত মানুষ ঘুম থেকে আবার উঠবে। ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী বাচ্চারা মৃত্যুর বিষয়টা বুঝবে। তবে আলাদা হয়ে যাওয়াটাকে তারা ভয় পায়।
- বাচ্চা যেন তার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে সেজন্য তাকে উৎসাহ দিন। তার প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর দিন।
- তার মধ্যে যেন ভালোবাসা হারানোর ভয় না-ঢোকে। আর যা হয়েছে তার জন্য যে, সে কোনোভাবেই দায়ী না- এ ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করুন। কারণ অনেক শিশুকে দেখা যায়, আপন কারও মৃত্যুতে সে নিজে নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে। এমনও মনে করে যে, সে-ই এজন্য দায়ী।

মা হারানোর পর

মায়ের মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তার নাতির দায়িত্ব নেন। আবদুল মুত্তালিব কেমন মানুষ ছিলেন সে নিয়ে পরে এক অধ্যায়ে কথা বলব। এখানে আমরা নজর দেব নবির শৈশবে তাঁর দাদুর পরিবারের ওপর।

আচ্ছা কেউ কি বলতে পারেন রাসূল ﷺ-এর দাদির নাম কী? আমাদের সীরাহ বইগুলোতে দাদার ভূমিকা অনেক বেশি করে বলা থাকে। আসলে ঐ পরিবারের সব আয় উপার্জন তিনিই করতেন। তো সঙ্গত কারণেই তার কথা বেশি এসেছে। রাসূলেরও কিন্তু একজন দাদি ছিল। তার নাম ফাতিমা আমর।

বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঐটুকু বয়সে মমতা দিয়ে তিনিই আগলে রেখেছিলেন। কেন রাখবেন না? তিনি তো শুধু আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মা আমিনার শাশুড়ি। রাসূল ﷺ-এর বাবা আবদুল্লাহ তো তারই আদরের ছেলে ছিলেন।

ছয় বছর পর্যন্ত শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁর মা আমিনা। মায়ের মৃত্যুর পর সে অভাব পূরণ করেন দাদি ফাতিমা। রাসূলের ছোট মেয়ের নাম তো সবাই কমবেশি জানি, ফাতিমা। রাসূল ﷺ কি তাঁর দাদির সম্মানে মেয়ের নাম ফাতিমা রেখেছিলেন? এটা হলফ করে বলা যায় না। তবে সেই সম্ভাবনা উড়িয়েও দেয়া যায় না।

অপূর্ব বালক

বালক হিসেবে রাসূল ﷺ ছিলেন অসাধারণ। হাদিস থেকে দেখা যায়, তাঁর দাদা ছোটবেলাতেই এটা খেয়াল করেছিলেন। বলেছিলেন এই ছেলে বড় হয়ে বিশেষ কিছু হবে। প্রায় একই রকমের ভবিষ্যদ্বাণী আরও একজন করেছিলেন। ১২ বছর বয়সে কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ যখন সিরিয়া সফরে যান, তখন এক সন্ন্যাসী এ রকমটা বলেছিলেন।

বালক মুহাম্মাদ ﷺ যখন দাদার ঘরে লালিত হচ্ছেন, তখন দাদার বয়স আশির কোঠায়। খুব ভালোবাসতেন নাতিকে। তবে এই নাতি যে এক সময় নবি হবেন এমন কথা তারা হয়তো কল্পনাতেও কোনোদিন ভাবেননি। তাঁর মাও কি কখনো এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন? বড় হয়ে বিশেষ কিছু হবেন এ পর্যন্তই হয়তো।

তাঁকে নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস তাঁর কানেও পৌঁছাত। বার বার পৌঁছাত। তাঁকে নিয়ে তাদের ভাবনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। যে বাচ্চা সব সময় বাবা- মায়ের মুখে শোনে সে ভদ্র, স্মার্ট, বড় হয়ে ভালো কিছু হবে- সেই বাচ্চাকে দেখবেন; আর যে-বাচ্চা প্রতিনিয়ত বাবা-মায়ের গালি আর বকা খায়, সে বাচ্চাকে দেখবেন। দুই বাচ্চার বেড়ে ওঠাতে বিস্তর পার্থক্য খুঁজে পাবেন।

বাবা-মায়ের কাছ থেকেই কিন্তু শিশুরা নিজেদের ব্যাপারে জানতে শেখে। কারণ বাবা-মা তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনে। কাজেই তাদের কথা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সেখান থেকেই তার মধ্যে আত্মমর্যাদা গড়ে উঠে। তারা যা বলেন, সেগুলোর অনুরণন তার কানে বাজতে থাকে। কাজেই শিশুদের নিয়ে যা-ই বলবেন, ভেবেচিন্তে বলবেন!

বাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন

- প্রতিটা শিশুর মধ্যেই প্রতিভা আছে। আপনার নিজের বাচ্চাটাও প্রতিভাবান। আপনি তার প্রতিভা আবিষ্কারে সাহায্য করুন। তার প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করুন। সে যদি দেখে আপনি তার পাশে আছেন, তাকে সাহস যোগাচ্ছেন, তাহলে সে-ও নিজের সামর্থ্য নিয়ে বিশ্বাস করতে শিখবে।

- বলার সময় কী কী শব্দ ব্যবহার করছেন, তা নিয়ে সতর্ক থাকবেন। বিশেষ করে ও কী করবে না-করবে এ জিনিসগুলো বুঝিয়ে বলার সময় বেশি সতর্ক থাকবেন। আগে এক জায়গায় আমরা বলেছিলাম 'এটা করো না'- এই কথাটা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না। গঠনমূলক বা ইতিবাচকভাবে ওদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন। আপনি কী চাচ্ছেন সেটা বলুন। যেমন- 'চিৎকার করো না তো'। এভাবে না-বলে বলুন, 'আস্তে কথা বলো বাবা'।

- বাচ্চার নেতিবাচক অভ্যাস বদলানোর জন্য আঘাত না-করে সহায়ক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করুন। যেমন- 'এত আলসেমি করো না' এভাবে না-বলে সে যেন মজাদার বা প্রোডাক্টিভ উপায়ে সময় কাটাতে পারে সে উপায় তালাশ করুন।[৬]

আট বছর বয়স পর্যন্ত বালক মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাদার সাথে ছিলেন। এরপর চলে যান তাঁর চাচার বাড়িতে। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব-জীবনের শিক্ষাকে আমাদের বর্তমান জীবনে কীভাবে কাজে লাগিয়ে শিশু সন্তান প্রতিপালনে স্মার্ট হতে পারি, তার সংক্ষিপ্তসার তুলে এই অধ্যায় শেষ করছি।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা

বিষয়	রাসূলের শৈশব	আপনার শিশুর
শৈশব আবেগ-অনুভূতি	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ সবার ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আদর-যত্ন পেয়েছিলেন। তাঁর ইমোশনাল প্রয়োজন পূরণে তাঁর মা বেশিরভাগ সময় দিয়েছেন।	আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসুন। আদর করুন, যত্ন করুন। চুমু খান। জড়িয়ে ধরুন। তার প্রতি ভালোবাসার জানান দিন। এতে সে আপনার ভালোবাসা আরও গভীরভাবে অনুভব করবে। আর এভাবে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিকশিত হবে।
বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা	মরুভূমি থেকে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা শিখেছিলেন। সেখানে খেলাধুলা, আনন্দ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ওখানে যা শিখেছিলেন পরিবারে এসে সেটা আরও জোরদার হয়েছে।	হুমকি-ধমকি বা শাস্তির ভয় ছাড়া আপনার শিশুর আচার-আচরণের উন্নতি হবে এমন পরিবেশ দিন। খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। কারণ, এভাবেই শিশুরা সবচেয়ে ভালো শেখে।
ভাষা দক্ষতা	মরুভূমিতে থাকার কারণে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ অনেকের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। এতে করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ ও যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে।	বই পড়ার প্রতি আপনার সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে সাহায্য করুন। তাকে গল্প বলুন। তার কথা মন দিয়ে শুনুন।
আত্মবিশ্বাস	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ নিজের ব্যাপারে এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সব সময় উৎসাহমূলক কথাবার্তা শুনেছেন।	আপনার শিশুর প্রতিভা খুঁজে বের করুন। তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করবেন না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার

শিশুদের বেড়ে ওঠায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। বাবা-মায়ের ওপর থেকে চাপ কিছুটা কমাতে পারে। রাসূল ﷺ এতিম ছিলেন। বর্ধিত পরিবারে বড় হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিভিন্ন ঘটনা শুনে তিনি দয়াশীলতা, নেতৃত্বগুণ, লেগে থাকার মতো বিষয়গুলো হাতে-কলমে শিখেছেন। আজকাল স্কুল, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। আবার উল্টো ফলও এনে দিতে পারে। তবে যাহোক, বাবা-মায়ের বাইরেও শিশুদের অনুকরণীয় আদর্শ বা রোল মডেল প্রয়োজন। বর্ধিত পরিবারের কাজটা এখানেই। বর্ধিত পরিবারের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব না হলে শিক্ষক, প্রতিবেশীরা এর বিকল্প ভূমিকা পালন করতে পারেন। এটা শিশুদের চিন্তাভাবনার পরিধি বাড়ায়। বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দেয়।

বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলব রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবার নিয়ে। বর্ধিত পরিবার বলতে বাবা-মা ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে বুঝাচ্ছি। এই অধ্যায়ে আমরা রাসূল ﷺ-এর দাদা ও চাচা-চাচি সম্পর্কে জানব। রাসূল ﷺ-এর বেড়ে ওঠায় তারা বেশ বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বেশিরভাগ সিরাহ বইগুলোতে তাদের ভূমিকা নিয়ে সামান্যই কথা হয়। তবে আমরা যদি তার জীবনকে বুঝতে চাই তাহলে তাদেরকে জানাটা জরুরি।

কেউ কেউ ভাবেন বর্ধিত পরিবারের বিষয়টা অতিমাত্রায় জটিল। তারা বিষয়টার শাখা-প্রশাখায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। আধুনিক আরবিতে সুদীর্ঘ নাম ব্যবহারের প্রচলন নেই। তো বর্ধিত পরিবার নিয়ে আলাপ করতে যেয়ে এত বড় বড় নামের তালিকা দিয়ে কী করবেন, সেটা হয়তো বুঝতে পারেন না কেউ কেউ। সুদীর্ঘ নামের বৃত্তে আমি ঘুরপাক খাবো না। কিংবা এগুলোর খুঁটিনাটিতে পড়ে থাকব না; বরং রাসূল ﷺ-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া অংশগুলো নিয়ে কথা বলব। এগুলো আমাদের গড়ে ওঠায় সাহায্য করবে। রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যদের এমনভাবে তুলে ধরব, মনে হবে আপনি তাদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।

পরিস্থিতি যা-ই হোক, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা নিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে কথা বলেছি। এখানে কথা বলব, আপনার বা আপনার সন্তানের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত পরিবারের ভূমিকা নিয়ে। ঠিক যেমন প্রভাবময় ছিল রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবার।

দাদা-দাদি, নানা-নানি, ফুফু-খালা, মামা-চাচা এদের সবাই আপনার শিশুকে বেড়ে ওঠায় সহযোগিতা করতে পারে। রাসূল ﷺ-এর বেলায় এই কাজটি করেছেন তাঁর দাদা ও চাচা। এতে বাবা-মায়ের ওপর চাপ কমে। আর এতে অন্য লাভও আছে। একেকজনের জীবন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন। যে কারণে শিশু একেকজনের কাছ থেকে একেক রকম অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। যদি বর্ধিত পরিবারে না-থাকেন, তাহলে ভালো বিকল্পের ব্যবস্থা করুন। যেমন- প্রতিবেশী বা শিক্ষক।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সন্তান লালন করার দায়িত্ব বাবা-মা একা পালন করবেন না। তাদেরকে বহু ধরনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মুখোমুখি করাবেন।

বর্ধিত পরিবার

বর্ধিত পরিবারে বাবা-মা, সন্তান, দাদা-দাদি, চাচা, ফুফু এবং কাজিনরা কাছাকাছি থাকেন। এ ধরনের পরিবারের গুরুত্বের বিষয়টা আরবি ভাষা থেকেও বুঝা যায়। ইংরেজিতে চাচা, মামা, ফুফা, খালু

সবকিছুর জন্য একটাই শব্দ; আঙ্কেল। আরবিতে আলাদা আলাদা চারটা শব্দ আছে। বাংলাতেও তা-ই। আবার কাজিনদের জন্যও আটটা ভিন্ন ভিন্ন আরবি শব্দ আছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধিত পরিবার সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর আবেদন হারিয়ে গেছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে এর প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়। কারণ এর আগে মানুষের জীবন কৃষি নির্ভর ছিল। ওখানে কাজেকর্মে একে অপরের সহযোগিতার দরকার ছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর সেটার আর প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের সমাজেও এই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। বর্ধিত পরিবারের বন্ধনগুলো ঢিলে হয়ে যায়। তৈরি হয় একক পরিবার। সন্তান লালন-পালনের পুরো দায়িত্ব তারা একাই পালন করেন। মা যদি কর্মজীবী বা অন্য কোনো কারণে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে কাজের লোক এই দায়িত্ব নেয়।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের বলছি না যে চলুন, সবাই মিলে আবার এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করি। পুরোনো সেই রোমান্টিক পরিবেশে ফিরে যাই। আমার মূল পয়েন্টটা হচ্ছে, সন্তান লালন-পালনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আবারও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করুক।

ইউরোপের কিছু দেশ কিন্তু বর্ধিত পরিবারের সেই ধারা ফিরিয়ে এনেছে। 'দ্যা টেলিগ্রাফ' পত্রিকা ২০০৮ সালে একটা প্রতিবেদন ছাপিয়েছিল। সেখানে তারা বলেছে যে, ব্রিটেনের সাড়ে আট লাখ পরিবারে বাড়তি সদস্য থাকেন। তাদের ধারণা ২০২৮ সালের মধ্যে সেটা শতকরা ৩০ ভাগে পৌঁছাবে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আলাদা থাকার কারণে সন্তান আর পিতা-মাতার দেখাশোনা করা অনেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য কঠিন। সবাই মিলে যদি কাছাকাছি থাকেন, তাহলে এই কাজ সহজ হয়।

রাসূল ﷺ-এর পরিবার

রাসূলের ﷺ-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আবদুল মুত্তালিব ইবন্ হাশিম ইবনে আবদু মানাফ ইবন্ কুসাই। প্রথাগতভাবে আরবে সন্তানের মূল নামের শেষে বাবা অথবা মায়ের বাবা, দাদা, বড় দাদার নাম যোগ করা হয়। আধুনিক আরবে এর কিছু কিছু নামের চল নেই। সংক্ষেপে তাই এগুলোর কিছু পরিচয় দিচ্ছি।

কুসাই

তার আসল নাম ছিল যাইদ। কিন্তু পরে কুসাই নামেই পরিচিতি হন। এ নামের অর্থ- 'অনেক দূরে'। অল্প বয়সে তিনি ঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন বলে তাকে এই নামে ডাকা হতো।

আবদু মানাফ

আসল নাম আল মুগিরা। রাসূল ﷺ-এর দাদার দাদার দাদা। তার নামের অর্থ 'মানাফের দাস'। আরব মূর্তিপূজারীরা ইসলামের আগে মানাফ নামে এক মূর্তির পূজা করত। সংগত কারণেই এ নামের আর কোনো অস্তিত্ব নেই এখন।

হাশিম

আসল নাম আমর। হাজিদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে তিনি হাশিম নামে পরিচিত হোন। নামের অর্থ- রুটি বিতরণকারী।

আবদুল মুত্তালিব

তাঁর আসল নাম শাইবা। মক্কার লোকেরা তাকে দেখে মুত্তালিব নামে এক ব্যক্তির দাস মনে করেছিল। সেজন্য তারা ঐ নামে ডেকেছিল। পরে ওই নামেই তিনি পরিচিত হন।

রাসূল ﷺ তাঁর বংশের লোকদের ব্যাপারে জানতেন। তাদের অর্জনের ব্যাপারে জানতেন। মক্কার লোকদের একটা ঐতিহ্য ছিল। তারা গল্প-কবিতা দিয়ে তাদের পরিবারের কাহিনি গর্বের সাথে বলে যেত। বর্ধিত পরিবারের ভূমিকা কেবল জীবিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যারা মারা গিয়েছেন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে তাদের যদি কোনো অনুপ্রেরণামূলক কীর্তি থাকে।

রাসূল ﷺ-এর পূর্বপুরুষ আর তাদের যেসব অর্জন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, সে ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেয়া যাক। কুসাইকে দিয়ে শুরু করি।

কুসাই : মক্কায় কুরাইশ গোত্র এক সময় দুর্বল ছিল। বিভক্ত ছিল। তিনি কুরাইশ গোত্রকে এক করেন। তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই মক্কার ইতিহাসে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ (Key Figure)। তার জন্ম মক্কাতে।

তবে বড় হয়েছেন মক্কার বাইরে। দীর্ঘ সময় পর সেখানে ফিরে খুযা গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। তখন খুযা গোত্র কাবার দায়িত্বে ছিল। কুরাইশ গোত্র এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পাক এমন এক আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জেগে ওঠে। এজন্য তিনি তার গোত্রকে একতাবদ্ধ করেন এবং এক সময় খুযা গোত্রকে সরিয়ে মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের হাতে চলে আসে।

তিনি তখন যেসব দায়িত্ব পালন করতেন-
১. মক্কায় ভ্রমণকারীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা।
২. হাজিদের পানি, দই, মধু সরবরাহ।
৩. কাবার রক্ষণাবেক্ষণ।
৪. প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় হাল ধরা।

তিনি একা একা মক্কা শাসন করতে চাননি। 'ফোরাম' নামে তিনি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য গোত্ররাও আলোচনায় বসত। নগর শাসন নিয়ে তাদের মতামত দিত। পরামর্শ দিত।

এখন সবচেয়ে মজার দিক হলো- কুসাই যে অবস্থায় ছিলেন, তাতে করে এ ধরনের স্বপ্ন ছিল দুঃস্বপ্ন। তার গোত্র বিভক্ত। তিনি বড় হয়েছেন মক্কার বাইরে। মক্কাবাসীদের কাছে তিনি বহিরাগতের চেয়ে বেশি কিছু না। তার তেমন কোনো সমর্থকও ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। মক্কাবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছেন। ইতিহাসবিদ ইবন্ হিশাম তাকে ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যাকে সারাজীবন অনুসরণ করতে পারে।

উনার এসব কৃতিত্বের কথা রাসূল ﷺ অবশ্যই শুনে থাকবেন। পারিবারিক বিভিন্ন আলাপচারিতায় এসব প্রসঙ্গ উঠে আসা অস্বাভাবিক না। এ থেকে রাসূল ﷺ যেটা শিখে থাকবেন সেটা হচ্ছে, কোনো কিছু পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি দরকার সেটা নিজের থেকেই নিতে হবে। আশপাশ থেকে না। তা না হলে পরিবর্তন আনা সম্ভব না।

আবদু মানাফ : মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আদর্শ চির অমলিন, চিরকালীন। অনুসারীরা যদি আদর্শের অনুসরণ না করে ব্যক্তিপূজা করে, তাহলে এক সময় সেটা দ্বন্দ্বে রূপ নেবেই নেবে। চেঙ্গিস

খান, টেমারলেন, আলেক্সান্ডার দ্যা গ্রেটের সময়ের পর এমনটাই হয়েছে। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর মক্কাতেও তাই হয়েছে। কাবার দখল কে নেবে- এ নিয়ে তার দুই ছেলে আবদুদ দার ও আবদু মানাফের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।

সমাবেশ আয়োজন, প্রতিরক্ষার জন্য সেনা প্রস্তুত ও কাবার চাবি রক্ষণের ভার নেন আবদুদ দার। আর হাজিদের খানাপিনার দায়িত্ব নেন আবদু মানাফ। পরে এটা তিনি তার ছেলে হাশিমকে দেন। হাশিম ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দাদার দাদা।

হাশিম : গরিব আর হাজিদের খাওয়ানোর বিষয়টাকে তিনি বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। তিনি তাদের সেরা উটের মাংস দিতেন। তার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তবে তারপরও তিনি নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন। কুরাইশদের কাছ থেকে দান নিতেন।
এক কবি হাশিমের প্রশংসায় বলেছেন,

> 'মক্কার ভুখানাঙাদের জন্য হাশিম দুধে ভেজা খাবার তৈরি করেছে;
> শীত আর গ্রীষ্মের কাফেলা প্রতিষ্ঠা করেছে।'

ক্ষুধার্তদের খানাপিনার ব্যবস্থা করায় কবি হাশিমের প্রশংসা করেছেন। শীতে ইয়েমেনে আর গরমে সিরিয়াতে বাণিজ্য কাফেলা পাঠানোর ঐতিহ্য পুনরায় চালু করায় তাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

দান করতে হলে আপনার কাছে অনেক টাকা থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন না। হাশিমের কাছ থেকে আমরা তো তা-ই শিখি। টাকাপয়সা ছাড়াও আপনি আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন অথবা সময় দিতে পারেন। এভাবেও মানুষের উপকার করা যায়, দান করা যায়।

হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের সাথে তাকে চলতে হয়েছে। এত মানুষের সাথে চলতে যেয়ে তাকে নিঃসন্দেহে অনেক চাপ সামলাতে হয়েছে। কখনো কখনো মানুষের কটু ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্যই এগুলো তিনি ধৈর্যের সাথে করেছেন। মানুষ তাঁর উদারতা ও সহনশীলতার কথা তাঁর মারা যাওয়ার পরও যে মনে রেখেছে উপরের কবিতাটি তার প্রমাণ। সুতরাং রাসূল ﷺ-ও যে এসব ঘটনা শুনে থাকবেন সেটা আশ্চর্যের না। হয়তো এসব ঘটনা থেকে তিনি অনুপ্রেরণাও নিয়ে থাকবেন।

রাসূল ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তার নানা ওয়াহাব আবদু মানাফ। তিনি মদিনার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং গোত্র প্রধান ছিলেন। আমিনাকে তিনিই দৃঢ়চেতা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যে কারণে আবদুল মুত্তালিব তার ছেলে আবদুল্লাহর সাথে তার বিয়ে দিতে রাজি হন।

আবদুল মুত্তালিব : আগেই বলেছি তার আসল নাম ছিল শাইবা। তিনি তাঁর বাল্যকাল মদিনায় কাটিয়েছেন। মদিনার নাম তখন ইয়াসরিব। তাঁর মায়ের নাম সালমা। তিনি তাঁর উচ্চতা, সুদর্শন চেহারা আর স্বভাবজাত নেতৃত্বগুণের কারণে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। এক সময় তিনি তাঁর গোত্রের প্রধান হয়ে ওঠেন। মক্কার ইতিহাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর সাথে সম্পর্কিত। যথা-

১. যমযম কূপ পুনরায় খুঁজে পাওয়া।
২. হস্তীবর্ষ।

যমযম আবিষ্কার

জুরহুম গোত্র যমযম কূপকে ঢেকে ফেলেছিল। তারা ছিল নবি ইবরাহিম (আ.)-এর ছেলে নবি ইসমাঈল (আ)-এর মামার গোত্র। মক্কাবাসীদের অনেক দিনের বাসনা ছিল আবার যদি কোনোভাবে তারা এই কূপের খোঁজ পেতেন! কিন্তু কেউ জানত না যে, এটা কোথায় হারিয়ে গেছে। পানির উৎস খুঁজতে যেয়ে রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব এই কূপের মুখ খুঁজে পান। আনন্দে তার চোখমুখ ভরে গেল। মাটি থেকে তার দুহাতে পানি ছলকে উঠল। ঠিক যেমন উঠেছিল মা হাজেরার হাতে।

যমযম কূপ খুঁজে পাওয়ার পর মক্কার পানি সমস্যার একটা সুরাহা হলো বটে। কিন্তু কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ঝামেলা লেগে গেল। আবদুল মুত্তালিবের হাতে এই কূপের নিয়ন্ত্রণে দেখে অনেকের ভালো লাগল না। তারা ঠিক করলেন সিরিয়ার এক যাজিকার মাধ্যমে এটার মীমাংসা হোক।

পথে যেতে যেতে নতুন বিপত্তি হলো। তাদের সঙ্গে নেয়া সব পানি ফুরিয়ে গেল। পানির অভাবে সবাই ধরেই নিয়েছিল যে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এমনকি তারা তাদের কবর পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তা করলেন না।

তিনি বললেন, 'মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যর্থতা'। যেভাবে কোমর বেঁধে তিনি যমযমের কূপ খুঁজতে লেগেছিলেন, সেভাবে সেই অবস্থাতেও তিনি পানি খুঁজতে লাগলেন। এক সময় পেয়েও গেলেন। সেই পানি খেয়ে সবার প্রাণ বাঁচল। তাদের মনে হলো পুরো ঘটনাটা আবদুল মুত্তালিবের পক্ষে মহান আল্লাহর বিধান। যমযম নিয়ে তারা তাদের আপত্তি ওখানেই ছেড়ে দেন।

যমযম কূপের মুখ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা নতুনভাবে বলা আমার উদ্দেশ্য না। এই ঘটনাটা শুনে বাল্যকালে রাসূল ﷺ-এর মনে কী প্রভাব পড়েছিল সেটাই আমার উদ্দেশ্য। এই কাহিনিতে স্বপ্নপূরণে চোয়াল বাঁধা প্রতিজ্ঞার কথা বলা আছে। সমাজকে কিছু দেয়ার কথা বলা আছে। পরিস্থিতি যা-ই হোক, আশেপাশের সব মানুষও যদি হাল ছেড়ে দেয়, তেমন পরিস্থিতিতেও হার না-মানা মানসিকতার কথা বলা আছে। কাহিনিটা আমাদের যেন বলছে, 'উঠে দাঁড়ান। চেষ্টা করুন। না পারলে আবার চেষ্টা করুন।'

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনে কতবার কত কঠিন কঠিন সব সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন। এরকম সময়ে এমন কিছু দরকার যা মানুষকে উৎসাহ দেয়। মনকে শক্ত করে। দাদার সেই ঘটনা নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ-এর কঠিন সময়ে উৎসাহ দিয়েছে।

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অনুপ্রাণিত করা পরিবারের বাড়তি সদস্যদের অন্যতম ভূমিকা। আপনার ও আপনার শিশু দুজনের জীবনেই তা প্রেরণা দিতে পারে। মানুষের পুরো জীবনই যে ঘটনাময়। কিন্তু দাদা-দাদি, নানা-নানিদের এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব অনেক জোরালো।

হস্তীবর্ষ

কঠিন সময়গুলোতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা, আতঙ্কিত না-হওয়া; বরং মহান আল্লাহর ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়ার বিষয়গুলো হস্তীবর্ষের শিক্ষা।

ইয়েমেনে আবরাহা নামক এক খ্রিষ্টান শাসক ছিলেন। ইথিওপিয়ান। তিনি সেখানে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। তার ইচ্ছে ছিল, আরব উপদ্বীপের সব তীর্থযাত্রীর পুণ্যজায়গা হবে ইয়েমেনে তার বানানো এই গীর্জা। তার এই খায়েশপূরণে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কাবা। তাই তিনি ওটাকে মিটিয়ে দিতে চাইলেন। বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে তিনি মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। রাসূল ﷺ যে বছর জন্ম নেন এটা সে বছরেরই ঘটনা।

আরবে হাতির দেখা পাওয়াটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। আবরাহার বাহিনীতে ছিল বিশাল হাতি। যে কারণে আরবেরা এই ঘটনাকে 'হস্তীবর্ষ' নামে মনে রেখেছিল।

এই বিশাল বাহিনীর সামনে বিনা যুদ্ধে হাল ছেড়ে দেয়া ছাড়া আরবদের কোনো উপায় ছিল না। তবে আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে এ নিয়ে কোনো আতঙ্কের ছাপ দেখা যায়নি। তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে চাইলেন। আবরাহার সৈন্যরা মক্কায় প্রবেশ মাত্রই লুটপাট শুরু করে দিয়েছিল। তারা আবদুল মুত্তালিবের উট ছিনতাই করেছিল। সেগুলো ফিরিয়ে নিতেই তিনি তার সাথে দেখা করেন।

আবদুল মুত্তালিবের কথা শুনে আবরাহার চোয়াল খুলে পড়ল। এই বৃদ্ধ বলে কী? আমরা তার শহর দখল করে নিয়েছি, তার দায়িত্বে থাকা কাবা ধ্বংস করতে এসেছি, কোথায় সে ওগুলোর মীমাংসার ব্যাপারে কথা বলবে; তা না, তিনি এসেছেন তার উটগুলো ফিরিয়ে নিতে! তিনি তাকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কাবার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলেন। উট নিয়ে না'। আবদুল মুত্তালিব ঝটপট জবাব দিলেন, 'কাবার একজন প্রভু আছেন। তিনিই একে রক্ষা করবেন'।

আবরাহা কাবা ধ্বংস করার হুকুম দিলেন। কিন্তু তার হাতি এক চুলও নড়ল না। উপর থেকে পাখিরা নুড়িপাথর ফেলতে লাগল। সৈন্যদের দেহ গলে যেতে লাগল। বাকিরা পালিয়ে বাঁচল।

আরবদের চোখে এই ঘটনা ছিল অলৌকিক। পবিত্র শহর হিসেবে মক্কার মর্যাদা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কুরআনুল কারিমের সূরা আল ফিলে এই ঘটনা বলা আছে-

> 'হস্তীবাহিনীর সাথে তোমার প্রভু কি করেছিলেন দেখেছ? তিনি কি তাদের পরিকল্পনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকেঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন। পোড়া কাদামাটির নুড়ি বর্ষণ করেছেন। তাদের অবস্থা হয়েছিল ফসল তোলা ক্ষেতের মতো।'

আবদুল মুত্তালিব তার সন্তান আর নাতি-নাতনিদেরকে অসংখ্যবার এ ঘটনা বলে থাকবেন হয়তো। তিনি তাদের মধ্যে এই কথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে, যেসব ঘটনা নিজের জীবনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে, সেসব ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বিশ্বাস রাখো আল্লাহ তোমার সাথে আছেন।

তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন না। অত্যাচারীদের ওপর তিনি কখনো খুশি নন। তার ঘরের অমার্যাদা তিনি কখনো বরদাশত করবেন না।

হতাশার কাছে হার মানবেন না। নিজের ন্যায্য অধিকার ছাড়বেন না; বরং ভদ্রভাবে সেগুলোর দাবি করুন। মনে রাখবেন, খারাপ সময়ের পর ভালো সময় আসে। কখনো উদ্ভটভাবে। কখনো-বা অপ্রত্যাশিতভাবে।

শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন

যেসব অর্জন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগই দু-একজনের কলিজার জোরে। টাকাপয়সা বা জনবলের আধিক্যের কারণে না। বলুন তো, কজন মিলে কাবাঘর বানিয়েছিলেন? ইবরাহিম ও তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম)। মাত্র দুজন। অথচ লাখ লাখ লোক এখন সেখানে হজ্ব করে। যে যমযম কূপ থেকে হাজিরা পানি খায়, সেই কূপ খুঁজে পেলেন আবদুল মুত্তালিব।

আমি চাই, এই ঘটনা আপনাকে অনুপ্রাণিত করুক। উপায়-উপকরণ যত কমই হোক না কেন, আপনার সামর্থ্য যত অল্পই হোক না কেন, জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন। দেখবেন, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পেয়ে গেছেন। লড়াকুর কোনো পরাজয় নাই।

তিনি ও তার সঙ্গীরা যে চরম বিপাকে পড়েছিলেন, তাতে করে তিনি সহজেই হাল ছেড়ে দিয়ে বাকিদের মতো নিজের কবর খুঁড়তে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি পানির উৎস খুঁজেছেন। পরে পেয়েছেনও। সেই পানি খেয়ে তিনিসহ বাকিদের প্রাণ বেঁচেছে। সুতরাং হাল ছাড়বেন না। সাফল্য আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে। আবদুল মুত্তালিব যে পানির উৎস পেলেন হয়তো তার নিরাশ সঙ্গীদের পায়ের তলাতেই তা লুকিয়ে ছিল।

> 'নিদারুণ বেদনার সময় মনকে শক্ত করুন। এমনকি মৃত্যুমুখে হলেও। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আহত সিংহও জানে কীভাবে গর্জন করতে হয়।' 'স্যামুয়েল হানাগিদ', দশম শতাব্দীর ইসলামিক স্পেনের হিব্রুভাষী কবি।
>
> 'জীবনের কঠিন দুঃখ মোকাবেলার সাহস রাখুন। ছোটগুলোতে ধৈর্য ধরুন। প্রচণ্ড খেটেখুটে প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ অর্জনের পর শান্তিতে ঘুমোতে যান'। [ভিক্টর হুগো]

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নারী সদস্যা

রাসূল ﷺ-এর পরিবারে নারীরাও সমানতালে অনুপ্রেরণা ছিলেন। আসুন এবার তাদের কয়েকজনের কথা জেনে নিই-

সালমাঃ হাশিমের স্ত্রী। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে তিনিই বড় করেছেন।

বারা আবদুল উয্যাঃ রাসূল ﷺ-এর নানি। আমিনার মতো বিশ্বস্ত স্ত্রী ও মমতাময়ী মা গড়ার কৃতিত্ব তার।

ফাতিমা আমরঃ রাসূলের দাদি। ছয় বছর বয়সে দাদার বাড়িতে পালিত হওয়ার সময় তিনিই রাসূল ﷺ-এর দেখাশোনা করেছেন।

পরিবারের এসব সদস্যরা কখনো গল্প শুনিয়ে, কখনো-বা নিজেদের জীবন কাহিনি শেয়ার করে শিশুদের বেড়ে তোলায় শিক্ষণীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা

এখন আমরা কথা বলব, রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা তার জীবনে কী ভূমিকা পালন করেছেন তা নিয়ে।

আমিনা

তিনি মদিনাতে জন্মেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চাইলে আবার সেখানে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু একমাত্র পুত্র মুহাম্মাদের জন্য যাননি। মক্কাতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

রাসূল ﷺ-এর বাবার মৃত্যুর সময় তার বয়স হবে বড়জোড় বিশের কোঠায়। চাইলে তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সেটা না-করে তিনি বিশেষ গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা অনেকের জন্যই অনেক বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে।

তার শাশুড়ি ফাতিমার সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তা ছিঁড়ে যায়নি। যে কারণে মক্কাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। বিধবা আমিনার সব খরচপাতির ব্যবস্থা করেছেন শ্বশুর আবদুল মুত্তালিব। এ থেকে বুঝা যায়, পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুতেও তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক চমৎকার ছিল।

বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ নতুন কিছু না। গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলোতেও এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। আজকাল তো এটা কৌতুকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমিনার সাথে শ্বশুরবাড়ির সুন্দর সম্পর্ক আমাদের বর্তমান সময়ের শ্বশুর-শাশুড়ি ও বউদের অনুপ্রেরণা দেবে।

আবদুল্লাহ

আমরা জানি তিনি ২৫ বছর বয়সে মারা যান। তবে তিনি কিন্তু এর আগেও মারা যেতে পারতেন! যমযম কূপের খোঁজ পাওয়ার পর আবদুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। বিরোধের কারণ- যমযম কূপের দখল কে নেবে। সেই বিরোধের মীমাংসা হলে তিনি চাইলেন, এই কূপের উত্তরাধিকার দখল প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার ছেলে-নাতিরা পাক। একবার মানত করলেন, আল্লাহ যদি তাকে দশটা ছেলে দেন, তাহলে তিনি তাদের মধ্যে একজনকে কুরবানি করে দেবেন।

আল্লাহ তাকে সত্যিই দশজন ছেলে দিলেন। একদিন তিনি তাদের সবাইকে খড়ের গাদা থেকে খড় টানতে বললেন। যে সবচেয়ে ছোট খড় টানবে তাকেই কুরবানী দেয়া হবে। আবদুল্লাহ সবচেয়ে ছোট খড় টানলেন। তার বুক ধক করে উঠল। আবদুল্লাহকে কুরবানি দিতে হবে, এমনটা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি ছিলেন তার সবচেয়ে কাছের আর আদরের ছেলে। হয়তো এ কারণেই নাতি মুহাম্মাদের প্রতিও তার টান বেশি ছিল।

তো তার কিছু বন্ধু তাকে বললেন, গণকের কাছে যেতে। সে হয়তো তাকে মানসম্মান বাঁচিয়ে কোনো বিকল্প বলে দেবে। তিনি গেলেন। গণক বলল, ছেলের বদলে ১০০ উট কুরবানী দিতে। তিনি তা-ই করলেন।

এই ঘটনাও তিনি তার নাতিদের কাছে বলে থাকবেন। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমাদের কী ফায়দা?

- আপনাকে যারা সহযোগিতা করবে তাদের খোঁজ করুন (এক্ষেত্রে তার সন্তানেরা)।
- পরিবার দিয়ে অনুগৃহীত করায় মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানান।
- অন্যের উপদেশ শুনতে একগুঁয়ে হবেন না (এই ঘটনায় তার বন্ধুরা)।

- নিজের আইডিয়াগুলো অন্যদের জানান। ভালো ভালো আইডিয়া নিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন না। কে জানে, হয়তো এমন কোনো আইডিয়াই অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে।

আবদুল্লাহর কথায় ফিরে আসি। তিনি বেশ সুদর্শন ছিলেন। সন্দেহ নেই, তিনি অনেকের নজর কেড়েছিলেন। তবে তার পারিবারিক মর্যাদা, কাবাঘরের দায়িত্ব আর পারিবারিক ব্যবসার কারণে সতর্ক থাকতে হয়েছে, যাতে তাকে দিয়ে এমন কোনো কাজ না-হয় যেটাতে বংশের মুখে চুনকালি পড়ে। যাহোক, তিনি আমিনাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু সে বিয়ের সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। ফিলিস্তিন সফরের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। রাসূল ﷺ-এর জন্মের আগেই সন্তানের মুখ না দেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

পরিবারের সুব্যবহার

রাসূল ﷺ এতিম ছিলেন। তবে একা ছিলেন না। পরিবারের অন্যান্যরা তাঁর বাবা-মায়ের অভাব ঘুচিয়েছিলেন। তাদেরকে যারা চিনতেন তারা তাঁর কাছে তাদের গল্প করেছেন। এমনকি যারা সরাসরি তাদের চিনতেন না, তারাও তাদের কথা বলেছেন। তিনি মায়ের কাছ থেকে ত্যাগ শিখেছেন। বাবার কাছ থেকে ন্যায়পরায়ণতা শিখেছেন। দাদার কাছ থেকে হার না-মানা মানসিকতার পাঠ নিয়েছেন। বড়দাদা হাশিমের কাছ থেকে দানশীলতা আর বড়দাদার দাদা কুসাইয়ের কাছ থেকে নেতৃত্বের গুণ শিখেছেন। তাঁর বর্ধিত পরিবার এভাবেই তাঁকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্ধিত পরিবার আজও আছে। কিন্তু ছেলেমেয়ে বড় করায় তাদের ভূমিকা আজ যেন হারিয়ে গেছে। সন্তান মানুষ করা আজ বাবা-মায়ের একক দায়িত্ব হয়ে গেছে। এতে করে শিশুদের জগৎ ছোট হয়ে এসেছে। তাদের অভিজ্ঞতা সীমিত হয়ে পড়েছে।

মিসরীয় কবি আহমদ শাওকি বলেন–

> 'মা শিক্ষক। তবে পরিবার আরও বড় শিক্ষক। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের আছে নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা। এগুলো ছেলেমেয়েদের বড় করতে সাহায্য করে। কিংবা শিশুর জীবন বদলে দিতে সাহায্য করে।'

ইতিহাস জুড়ে বড় বড় অনেক মানুষ তাদের সাফল্যের পেছনে কোনো চাচা-মামা বা দাদা-নানার কথা বলেছেন। বাবা-মায়ের কথা বলেননি। তাই বর্ধিত পরিবারের সুব্যবহার করুন। তাদের সবাইকে সক্রিয় শিক্ষক বানান। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনে এদের কার শিক্ষা কাজে লাগবে কে জানে!

সন্তানকে বর্ধিত পরিবারের সাথে জুড়বেন কীভাবে

অনেক পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একসাথে থাকেন না। ভিন্ন শহরে বা ভিন্ন কোনো দেশে থাকেন। যে কারণে বাচ্চাকাচ্চারা তাদের প্রতি টান অনুভব করে না। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে সন্তানদের ভালো সম্পর্ক করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। এখানে আমরা কিছু বাস্তব আইডিয়া তুলে ধরছি-

- মোবাইলে ছবি দেখিয়ে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। তার নাম, নামের অর্থ, তাদের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক কোনো ঘটনা শেয়ার করুন। যেভাবে রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের ঘটনা আমরা এ অধ্যায়ে বলেছি।
- সন্তানকে তার বংশগাছ দেখান। দেয়ালে আঁকতে পারেন। কিংবা বড় আর্ট পেপারে। পরিবারের সদস্যদের কিমাত, কেন তাদের দরকার এগুলো তুলে ধরুন।
- অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আজকাল দূরের মানুষদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ। স্কাইপে, মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপের মতো অ্যাপগুলোর সঠিক ব্যবহার করুন।

বর্ধিত পরিবারের বিকল্প

অনেক সময় এমন হয় যে, বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা কাছাকাছি থাকেন না। অথবা হতে পারে তারা সেই অর্থে সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক নন। তাদের কাছে থাকলে সন্তান ভুল শিখবে। এক্ষেত্রে ভালো বিকল্প খুঁজতে হবে। ভালো বিকল্প হতে পারেন শিক্ষক, প্রতিবেশী। সন্তান বড় করার ভারটা যেন শুধু বাবা-মায়ের একার ওপর না-পড়ে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ অধ্যায়ে আমরা রাসূলের বর্ধিত পরিবারের ব্যাপারে কথা বলেছি। তাদের কারও কারও নাম, তারা কী করতেন সেসব জেনেছি। তাদের কোন কোন ঘটনা বা দিক রাসূল ﷺ-এর জীবনে প্রভাব ফেলে থাকবে সেগুলোর উল্লেখ করেছি।

নিচের টেবিলে আমরা দেখাব কীভাবে আমরা রাসূল ﷺ-এর জীবনের শিক্ষাগুলো বাস্তবে আমাদের সন্তান বড় করতে কাজে লাগাতে পারি। যাতে করে আমাদের পরিবারের বর্ধিত সদস্যরা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণদের থেকে শিক্ষা	
রাসূল ﷺ-এর পরিবার	**আপনার পরিবার**
রাসূল ﷺ এতিম অবস্থায় বড় হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি একাকী বেড়ে ওঠেননি। তার পরিবারের বর্ধিত সদস্যগণ তার বাবা-মায়ের অভাব দূর করেছিলেন।	আপনার পরিবারের বর্ধিত সদস্যরা সন্তানের একাকিত্ব দূর করে। যখন সে একাকী অনুভব করবে, তখন তারা সাথে বেড়াতে যেয়ে, রাতে থেকে তার একাকিত্বের কষ্ট দূর করে দিতে পারে।
শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর বর্ধিত পরিবার শিখিয়েছে। অনুপ্রেরণা দিয়েছে।	আপনার বর্ধিত পরিবার আপনার সন্তানকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। বিশেষ করে তাদের অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন কাহিনি শেয়ার করার মাধ্যমে।
বর্ধিত পরিবার বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনেক কিছু শিখিয়েছে। দাদার কাছ থেকে নেতৃত্ব, মায়ের কাছ থেকে মমতা, চাচার কাছ থেকে ব্যবসা ইত্যাদি।	আপনার বর্ধিত পরিবারের সদস্যরাও এরকম নানা কিছু শিশুকে শেখাতে পারেন। যেটা আপনার একার পক্ষে সম্ভব না। আপনিও এতে উপকৃত হতে পারেন।
বর্ধিত পরিবার বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিরাপত্তা দিয়েছিল। গরিব হলেও সম্ভ্রান্ত পরিবার।	আপনার শিশুকেও তারা অনুরূপ নিরাপত্তা দিতে পারে। বিশেষ সুবিধা পাওয়া সন্তান এরকম অনুভব করার চেয়ে সে যে ভালোবাসাময়, ঐক্যবদ্ধ পরিবারের অংশ সেটা অনুভব করা বেশি জরুরি।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারপাশ

আশেপাশের পরিবেশ আমাদের প্রভাবিত করে। তবে সেটা পুরোপুরি আমাদের গড়ে দেয় না। কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করতে থাকলে কোনো কাজ হয় না; বরং সক্রিয়ভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। আমার সমাজ আমার পাশে না-দাঁড়ালে আমাদেরকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। রাসূল ﷺ যখন কিশোর বা তরুণ, তখনো তিনি কিন্তু নবি হননি। তবে তাঁর মধ্যে একটা মজবুত বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বিদ্যমান সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। সমাজ যখন আমাদের ওপর চেপে আসবে, বেশিরভাগ লোকদের মনমানসিকতার সাথে মিশে যেতে জোরাজুরি করবে, তখন নিজেদের ও আশপাশের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে হবে। আমাদের সুবিধায় ব্যবহার করতে হবে।

আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান

আগের অধ্যায়ে আমরা আট বছর পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর বাল্যকাল নিয়ে কথা বলেছি। তাঁর বেড়ে ওঠায় তাঁর মা, দুধ-মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবদান নিয়ে কথা বলেছি। এখানে আমরা কথা বলব মক্কায় রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, সেই পরিবেশ, সেখানকার লোকজন আর সমাজের ব্যাপারে।

চৌদ্দ শ বছর আগে রাসূল ﷺ কোনো-না-কোনো পরিবেশে বড় হয়েছেন, তার সাথে আজকের জমানার লেনাদেনা কী? এমন প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। সময় তো এখন আর আগের মতো নেই। মূর্তি, উট কিংবা তলোয়ারের মতো বিষয়গুলো আধুনিক সমাজে অচল। আমরা এখানে সেই সময়ের মক্কার পরিবেশে খুব বেশি ভেতরে যাব না। তখনকার মানুষের মনমানসিকতা, চালচলন বুঝার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা শুধু সেটুকুর ব্যাপারে কথা বলব।

রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, সে পরিবেশের অবস্থা ফুটিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য। কারণ, কারও জীবন বুঝতে হলে এটা বুঝা জরুরি। আমি চাই, পাঠকরা যে পরিবেশে আছেন, তারা যেন সেটা নিয়েও ভাবেন। কীভাবে সেখানে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন সেটা নিয়ে ভাবেন।

নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেয়া

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের ৮৫ ভাগ সময় মক্কায় কাটিয়েছেন। ৬৩ বছরের মধ্যে ৫৩ বছর। বহু পরিবারে, বহু ঘরে, নানা পরিবেশে, নানা কাজে কাটিয়েছেন। বিয়ের পর তাঁর নিজের একটা পরিবার হয়। তাঁর বেশকিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল।

প্রতিটা পরিবেশে এমন কিছু থাকে, যা সেখানকার মানুষের ওপর কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলে। তবে এখানে মজার বিষয় হচ্ছে, তখনকার পরিবেশে বড় হয়েও কীভাবে রাসূল ﷺ নিজেকে আলাদা করেছিলেন। অথচ সেই একই পরিবেশে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল।

মানুষ তার পরিবেশের ফল। তবে এর মানে এই না যে, এ কারণে তাকে তার নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলতে হবে। আমরা দেখব, কীভাবে রাসূল ﷺ আশেপাশের মানুষের সাথে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বজায় রেখে চলেছেন। যেসব কাজ শুধু পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত, সেগুলোতে তখনকার কিছু নারীরা বাধা ঠেলে জয় করেছিলেন, উজ্জ্বল হয়েছিলেন। সেগুলোও দেখব। দেখব আরবদের মধ্যে থেকেও কীভাবে অনেক অনারব নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। মূর্তিপূজারীদের শেকড় ছিল যেখানে, সেরকম প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও কীভাবে এক আল্লাহর দাসত্বকারীরা আলাদা হয়েছিলেন।